ভাঙা গানের ধুলোয়

প্রবুদ্ধ বাগচী

'আবোলতাবোল'-এর শব্দকল্পদ্রুম মনে আছে? আসুন, তার থেকে দু-চারটে লাইন আউরে নিই ----
খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্, রাত কাটে ওই রে
দাড়্ দুড়্ চুরমার -- ঘুম ভাঙে কই রে
ঘর্ ঘর্ ভন্ ভন্ ঘোরে কত চিন্তা
কত মন নাচে শোন্ -- ধেই ধেই ধিনতা

তাহলে আজ থেকে কতদিন আগেই তো ঘুম ভাঙার শব্দ আমাদের চিনিয়ে দিয়ে গেছেন সুকুমার রায়। কিন্তু ঘুম ভাঙার শব্দ নয়, আমি বলছি, আপনারা কেউ গান ভাঙার শব্দ শুনেছেন কখনো? ভাঙাভাঙির কথায় আপনাদের হয়তো মনে পড়ে যেতে পারে তেলের শিশি ভাঙার সেই বিখ্যাত ছড়ার কথা, যেখানে রয়েছে ধেড়ে খোকাদের ভারত ভেঙে ভাগ কর ার কাহিনী। পাশাপাশি, মনে পড়ে যাচ্ছে, বহুকাল আগে রেডিও-র বিবিধ ভারতী কার্যক্রমে বহুল প্রচারিত একটি অ্য াডহেসিভ-এর বিজ্ঞাপন, যাঁরা দাবি করতেন ঃ ভাঙা সংসার ছাড়া আর সব কিছু এতে জোড়া লেগে যায়। তবে বাংলা ব া ভারত-ভাঙা 'ধেড়ে খোকাদের' দিন ফুরিয়েছে অনেকদিন। এখনকার 'ধেড়ে খোকা'রা পরমাণু ভাঙার পাশাপাশি ম ানুষকেও ভেঙেছেন নানা টুকরো করে, তবু এই লেখা তাঁদের নিয়ে নয়। আর, সংসার ভাঙা বা জোড়া লাগার পুরনো ক াহিনীকেও আমাদের আপাতত আগ্রহ নেই। কারণ, এ নিবন্ধ অন্য এক ভাঙাভাঙির কথা বলবে।

এটা গান ভাঙার কাহিনী। কে ভাঙলেন? গানগুলো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আর ভাঙা বলুন, জোড়া লাগানো বলুন সবই তঁ ার করা। তবে, জিজ্ঞাসা বলুন, আপত্তি বলুন তা এই ভাঙা-গড়া নিয়ে নয়, সেটা অন্য জায়গায়। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে আমাদের সীমাহীন মুগ্ধতার পাশাপাশি ক্ষমাহীন উপেক্ষা ও অজ্ঞতার যে বিরাট প্রেক্ষিত, হতে পারে, এই কাহিনী, সেই ধূসর প্রান্তরে কিছু জিজ্ঞাসার আলো-কে উন্মোচনে সাহায্য করবে।
ঠিক এখ্খুনি, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টির জগতে আর কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের আরোপিত স্বত্ব অবশিষ্ট নেই। এই বন্দে াবস্তটা ভালো কি মন্দ সে নিয়ে বাগবিতন্ডার কোনো অবকাশ পর্যন্ত নেই, কারণ, যে আইনি মারপ্যাঁচে ঝিভারতীর হাত থেকে রবীন্দ্রনাথ সরে এসেছেন, সে আইনের অন্যথা হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের গানও স্বত্বমুক্ত পরিমন্ডলের বাইরে নয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথের বইপত্র কারা কীভাবে প্রকাশ করছেন সেই দৃষ্টান্তের পাশাপাশি তাঁর গান ঝিভারতী সংগীত সমিতির নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবস্থায় কে কীভাবে গাইছেন, এটা একটা স্বাভাবিক কৌতুহলের বিষয়। গত এক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে যেটুকু বুঝেছি, গানের ক্ষেত্রে সংগীত সমিতির নিয়ন্ত্রণে একদল শিল্পীর বাড়া ভাতে ছাই পড়ছিল, কারণ তাঁরা নাকি এই অনুশাসনের প্রকোপে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন --- এরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। আরেক দলের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় কিছু কম। এঁরা এখনও নিজেদের গানের পাশে সংগীত সমিতির অনুমোদনের শীলমোহর ব্যবহার করতে চাইছেন, যদিও সংগীত সমিতির বিন্দুমাত্র কোনো প্রাসঙ্গিকতা আজ আর নেই, তবুও এই অনুমোদনচিহ্নের থেকে একটা সংকেত তৈরি হয় --- অন্তত এঁরা দলছুট হয়ে যাননি।
এ-দল সে-দল কোনো পক্ষেই নিজেকে জড়াতে আমার আগ্রহ নেই। তবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা নামক মস্ত বড় কথাটির আড়

ালে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে কিছু ভুল চর্চার সূত্রপাত হয়েছে বেশ কিছু আগেই -- হ্যাঁ, বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির নিয়ন্ত্রণ পর্ব জারি থাকার সময়েই। সম্প্রতি, অবাধ হাওয়ার খোলা স্রোতে তাতে গতির জোয়ার। এই পরীক্ষা-নিরিক্ষার নানা বিভঙ্গ, সবটা নিয়ে কথা বলার দরকার, তবে একেবারে সবটুকু বলার মতো পরিসর নেই। বলতে পারেন, বিবেকের দংশনে, সম্প্রতি আরো দু-চারটি ইতি-উতি লেখায় এ-সব নিয়ে সোচ্চার হবার চেষ্টা করেছি, এখানেও আর একটা ধরন নিয়ে কিঞ্চিৎ কথাবার্তা বলতে চাইছি।

এবারের প্রসঙ্গ সেই গান-ভাঙা বা ভাঙা-গানের চর্চাকে ঘিরে। বেশ কয়েকবছর আগে, গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে 'র পান্তরী' শিরোনামে একটি ক্যাসেট অ্যালবাম প্রকাশ করা হয়েছিল। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় আড়াই হাজার গানের সুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহু সময় নানা ধরনের নানা প্রদেশের এবং নানা দেশের সুরের সাহায্য নিয়েছেন। সেদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানকে বিশ্বের সামুহিক সুরের এক মোহানা বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই ক্যাসেট অ্যালবামের ক্যাসেটগুলিতে এমন কিছু গান নির্বাচন করা হয়েছিল যেখানে রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ গানের পিছনে অন্য কোনো গানের একটা পরোক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানের পাশাপাশি সেই প্রাসঙ্গিক গানগুলিও গীত হয়েছিল সেই ক্যাসেট অ্যালবামে। প্রধানত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের একটা যোগ াযোগের সূত্র ধরিয়ে দেওয়া সম্ভবত এই অ্যালবামের পরিকল্পনাকারদের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। এর মধ্যে দোষের কিছু আছে বলে মনে হয় না। যারা রবীন্দ্রনাথের নিবেদিত শ্রোতা তাঁদের একরকম অ্যাকাডেমিক কৌতুহলের নিবৃত্তির জন্য এমন একটা অ্যালবাম মন্দ কী?

যদিও মনে রাখা দরকার, নানান সূত্রে থেকে যেভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে সুর বসিয়েছেন তার সামগ্রিক পরিচয় এই পরিকল্পনায় পাওয়া যাচ্ছে না। শুধুমাত্র ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত এবং প্রাদেশিক রূপগুলিই এই ক্যাসেটে ছিল। এর ব াইরেও বাংলার লোকসংগীত ও ইউরোপীয় সংগীতের নানা ধারা রবীন্দ্রনাথের গানকে পুষ্টি জুগিয়েছে। ঠাকুরবাড়ির অন্যতম এক কৃতী সন্তান সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বৈতানিক' নামক যে সংগীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রসংগীতের ওপর নানা রকম আলোচনা সভার নিয়মিত ব্যবস্থাপনা করতেন। একটা সময়ে। সেউ সব সভায় সৌমেন্দ্রনাথ নানা সময় অনেক গুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন; সেরকমই এক ভাষণ সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের গানে দেশি বিদেশি সুরের প্রভাব নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছেন, যাতে আমাদের শোনা-চেনা রবীন্দ্রনাথের গানগুলির সুরের উৎস বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা হয়। সেই লেখাগুলি অনেকেরই পড়ার সুযোগ নেই আজ। তাই সচেতন প াঠকের আগ্রহ মেটাতে সংক্ষিপ্তাকারে সেই বিভাজন-তালিকা দিয়ে মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসব।

১) ইংরেজি গানের সুর (স্কটিশ, আইরিশ ইত্যাদি) ভেঙে করা রবীন্দ্রনাথের গান---

'কালী কালী বলো রে আজ', 'মানা না মানিলি', 'মরি ও কাহার বাছা', 'ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয়', 'আহা আজি এ বসন্তে', তুই আয়রে কাছে আয়', 'তবে আয় সবে আয়' ,'ও দেখবি রে ভাই আয়রে ছুটে', কতবার ভেবেছিনু', 'পুরনো সেই দিনের কথা', 'সকলই ফুরালো স্বপনপ্রায়', 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে', 'তোমার হলো শু, আমার হলো সারা' ইত্যাদি।

২) গুজরাটি গানের সুরে প্রভাবিত গান--- 'যাও রে অনন্তধামে', 'কোথা আছ প্রভু', 'এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি,' 'নমি নমি ভারতী' ইত্যাদি।

৩) শিখ ভজন থেকে তৈরি করা গান --- 'বাজে বাজে রম্যবীনা বাজে'

৪) মহিশুরী ভজনের সুর-সঞ্জাত গান --- 'চিরবন্ধু চিরনির্ভর', 'এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ', 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে'

৫) মহারাষ্ট্রীয় 'প্রবন্ধ' গানের সুরে রচিত তাল-ফেরতা গান -- 'বিশ্ববীণারবে মোহিছে'

৬) কর্ণাটকী গান থেকে তৈরি করা গান -- 'সকাতরে ওই কাঁদিছে', 'বড় আশা করে এসেছিনু', 'আজি শুভদিনে পিতার ভবনে,' 'বাজে কণ সুরে', 'বেদনা কী ভাষায়', বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী', 'নীলাঞ্জনা ছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববনে'

৭) উত্তর-ভারতীয় খেয়াল, ঠুংরি ও টপ্পার সুরে বসানো গান -- 'আজি মম জীবনে নামিছে', কোথা হতে বাজে', 'তোম াহীন কাটে দিবস দাও হে হৃদয় ভরে দাও', 'কোথা যে উধাও হলো', 'আয় লো সজনী সবে', 'মন জাগো মঙ্গললোকে', 'কে বসিলে আজি', হৃদয় বাসনা পূর্ণ হলো', 'এ পরবাসে রবে কে', 'বন্ধু রহো রহো সাথে', ইত্যাদি।

৮) বাংলার লোকসঙ্গীত, বাউল, কীর্তন, ঝুমুর ইত্যাদির সুর প্রভাবিত গান -- 'ও আমার দেশের মাটি', 'ছি ছি চোখের

জলে', 'যে তোরে পাগল বলে', 'এবার তোর মরা গাঙে', 'বাংলার মাটি, বাংলার জল', 'আমার সোনার সোনার বাংল া', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ', 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে,' 'ও নিঠুর কী আরো কি বাণ,' 'বসন্তে কি শুধুই কেবল,' 'তোমার খোলা হাওয়া', 'বাদল বাউল বাজায় রে', 'ওহে জীবনবল্লভ,' 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই', সখি বহে গেল বেলা', 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী', 'তবু মনে রেখো', 'পুরানো জানিয়া চেও না' ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। সেই সঙ্গে আরো একটা বিষয় হলো, এই নিদিষ্ট ধারা গুলির বাইরেও নানা ধার ার মিশ্রণেও রবীন্দ্রনাথ গান তৈরি করেছেন যেগুলিকে ঘোষিত কোনো গানের ঘরানার মধ্যে ফেলা যাবে না। যেমনঃ 'আ মি তোমার সঙ্গে বেধেঁছি আমার প্রাণ' (রাগ সংগীত ও কীর্তনের মিশ্রসুর), 'কান্না হাসির দোল দোলানো' (রাগ সংগীত ও বাউলের সমন্বয়), 'স্বপনপারের ডাক শুনেছি' (কীর্তন ও বাউল) ইত্যাদি। আরো একটা কথা, এতক্ষণ যে সব গানের উল্লেখ করা হলো তার অনেকগুলির পিছনে নির্দিষ্ট কোনো ভিনদেশি গানের ছাপ, আবার কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো গান নয়, একটা সুরের ঘরানার ছাপ আছে। সহজেই মনে পড়ে যায়, গগন হরকরার সুপরিচিত গান 'আ মি কোথায় পাব তারে'-র কথা, যার থেকে রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেছেন 'আমার সোনার বাংলা' বা 'হরিনাম দিয়ে জগত ম াতালে' থেকে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ', পঞ্জাবিভজন 'বাদে বাদে রম্যবীণ বাদে'থেকে সরাসরী হয়ে ওঠা 'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে', সিন্ধু রাগের টপ্পা 'বে পরিয়া তাতে'র সূত্রে 'কে বসিলে আজি', একইভাবে কর্ণাটকী একটি নিদিষ্ট গান থেকে 'বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী বা নিদিষ্ট মহিশুরী ভজন থেকে 'এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ' গানের সূত্রপাত।
মোটামুটিভাবে, এই হলো, রবীন্দ্রনাথের গান ভাঙা বা ভাঙা গানের প্রেক্ষাপট। রবীন্দ্রনাথের গানকে বুঝতে গেলে এইসব তথ্যগুলির প্রয়োজন আছে। 'রূপান্তরী' শিরোনামের ক্যাসেট অ্যালবাম সেই প্রয়োজন কিছুটা মিটিয়েছি একটা সময়। কিন্তু আমাদের সমস্যাটা অন্যত্র। পরীক্ষায় উন্মুখ কেউ কেউ এই একই ধারায় মূল গান আর ভাঙা গানের সম্মিলনে কিছু কিছু অ্যালবাম প্রকাশ করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে -- সেখানে একই শিল্পীকে দেখছি স্কটিশ বা আইরিশ বা মহিশূরী-কর্ণ াটকী বা খেয়াল - ঠুংরী গাইছেন, পাশাপাশি তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের গানটিও গাইছেন। এই সব শিল্পীর সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই, সেরকম গান গাইতে পারার প্রতিভাকে সমাদর জানাতেই হবে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় এই বিশেষ ধরণটাকে ঘিরে। কারণ, এঁদের অনেকে আবার মঞ্চানুষ্ঠানেও এই গান ভাঙা ভাঙি নিয়ে বিশেষভাবে সময় বরাদ্দ রাখছেন এবং এর থেকে একটা জিনিসকে শ্রোতার কাছে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হচ্ছে যে, ওইটা মূল গান আর এইটা হলো সেই তথ াকথিত ভাঙা গান।
আবার বলি, প্রশ্ন থাকছে এই পরিবেশনের ঘারানায়। কেননা, যাঁরা বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত গানের সুর ভেঙে রবীন্দ্রনাথের গান বাঁধার খবর রাখেন, তাঁরা পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের গান তৈরির নেপথ্য মানসিকতার খোঁজ রাখেন বলে মনে হয়। সেই ম ানসিকতাটা বাংলা গানের ক্ষেত্রে এক বিপ্লবীর মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি। কেন বিপ্লবী? কারণ, একেবারে কৈশোরের শু থেকে যখন ঠাকুরবাড়ির আবহে শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তাঁর, তখন থেকেই তিনি ভাবছিলেন কীভাবে সুরের দাসত্ব থেকে কথাকে মুক্তি দেওয়া যায়। তাঁর অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছিল শাস্ত্রীয় সংগীতকাররা কেবলই 'কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান' আর তাঁর প্রয়াস ছিল -- 'আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।' যদি খুব সংক্ষেপে বলি, তাহলে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক জীবনের সমস্তটা জুড়ে এই একটি ভাবনাই ধ্রুবপদের মতো ক াজ করে গেছে।
যাঁরা ধ্রুপদী সংগীতের প্রতিনিধি তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এইখানেই লড়াই, ঠিক যেমন লড়াই একজন বিপ্লবীর সঙ্গে প্রচলিত সমাজ-সংস্থার। তথাকথিত ওস্তাদদের নির্মম সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথই বলতে পারেন ঃ 'মহাদেব, নারদ এবং ভরতমুণিতে মিলে পরামর্শ করে যদি আমাদের সংগীতকে এমন চুড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়ে থাকেন, যে আমরা তাকে কবেলমাত্র মানতেই পারি, সৃষ্টি করতে না পারি, তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হয়েছে বলতেই হবে' ক ারণ 'মানুষ কেবল স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সচলভাবে সৃষ্টি করে।'এই সচল সৃষ্টির সূত্রেই তাঁর প্রায় তিন হাজার গ ানের মধ্যে অন্তত তিনশো গানে তাঁর আনকোরা সুরের রাগিনীর প্রতিষ্ঠা, সৌমেন্দ্রনাথ যার নাম দেন 'রবীন্দ্র-ভৈরবী'। অজস্র গানে তিনি প্রচলিত রাগ রাগিনীর সুনির্দিষ্ট সুরের ওপর কথাকে দাঁড় করাবার অভিপ্রায়ে, গানের সুর তাঁর কাছে

গানের কথাকে ভাবসমেত ফুটিয়ে তোলার হাতিয়ার - তার থেকে কিছু কমও নয়, বেশিও নয়। এবং এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে তিনি একান্ত ভাবেই আপোষহীন - 'যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভাল শুনায় আর তাতে বর্ণীয় ভাবের সহায়তা করে তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মন, আমি পঞ্চমকে বহাল রাখিব না কেন?'

এই আপোষহীন মনোভাবের জন্যই দেশ-বিদেশ যেখান থেকেই তিনি সুর আহরণ কণ না কেন, সেই সুরের সঙ্গে নিজের প্রাণের সুরের ঐর্য না মিশিয়ে তিনি তাকে গ্রহণ করার কথা ভাবেন নি। তিনি সত্যি করেই জানতেন নিজের রং আর নিজের সুর না মেশানো সে জিনিস নিজের হয় না। এসব প্রসঙ্গগুলোকে আবার নতুন করে সামনে আনতে হচ্ছে কারণ ভাঙা-গান আর মূল গানের কেরামতি দেখিয়ে যাঁরা ব্যক্তিগত দক্ষতা জাহির করতে লেগেছেন, তাঁরা হয় ভুলে গেছেন রবীন্দ্র-গানের এই প্রধান ভরকেন্দ্রকে, নতুবা এ বিষয়ে তাঁদের ক্ষমাহীন অজ্ঞতা এমন এক মূর্খামিকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে।

অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের গান যাঁরা গাইতে আসেন, রবীন্দ্রনাথের অপরাপর সৃজনভাবনা বিষয়ে তাঁদের না জানালেও দিব্যি চলে যায়। এমন কী গানের কথার যোগ্য মূল্যায়ণকেও তাঁরা সযত্নে এড়িয়ে যান, রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা বিষয়ক ভাবনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতেও তাঁরা সিংহভাগই গররাজি। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন কণ্ঠ আর শ-দুয়েক গান স্বরলিপি মেনে গাইতে পারলে স্বচ্ছন্দে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হয়ে ওঠা যায়। আক্ষেপের কথা, এতকাল ধরে রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেষ্ঠ সম্পাদকে আগলে রেখে বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি এই প্রবণতাকে পালটাতে পারেন নি। শুধুমাত্র স্বরলিপিরে শুদ্ধতা নিয়ে রক্ষণশীল এক রকম অবস্থান নিয়ে গানের ভুল প্রেক্ষিতও তৈরি হয়েছে এঁদের প্রশ্রয়ে। মূল-গান আর ভাঙা-গানের এই রসিকতা-পর্বে তাঁদের অবস্থান কী ছিল? তাঁরা তো তাঁদের অনুশাসন-পর্বেও এইসব পরীক্ষাধর্ম (?) ক্যাসেটকে অনুমোদন দিয়ে গেছেন। তাঁদের একবারও মনে হয়নি, নিছক অ্যাকাডেমিক আগ্রহ ছাড়া এই মূল-গান, ভাঙা-গানের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। তাঁরা কেন ভেবে দেখেন নি এই মূল-গান আর ভাঙা-গান নামক অভিধায় আসলে রবীন্দ্রনাথকে মনে হয়, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কম্ পোজার নন, নিছক এক নকলনবিস অনুকারক মাত্র। বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি ভাবানোর চেষ্টা করেন নি, রবীন্দ্রনাথের গানে কথার মূল্য সবথেকে বেশি, তাই য়ুরোপীয় সংগীত বলুন, ভারতের যে কোনো প্রাদেশিক সুর বলুন, বাংলার লোকাশ্রিত সুর যা-ই হোক, যেখান থেকে তিনিই সুর চয়ন কন না কেন, শেষ পর্যন্ত সেই গানটি সবার্থে রবীন্দ্রনাথের নিজের গানই হয়ে উঠেছে, যাতে বিশ্বের মহত্তম কবি আর শ্রেষ্ঠ সুরকারের স্পষ্ট স্বাক্ষর!

অস্বীকার করতে পারবেন, ঐ বিশেষ কর্ণাটকী গান আর 'বাসন্তী, হে ভুবনমোহনী' বা মহিশূরী ভজন আর 'এ কী লাবণ্যেস পূর্ণ প্রাণ' বা 'কোথা যে উধাও হলো' একই জাতের সৃষ্টি নয়। 'হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে' লোক সংগীতের পাশে রেখে কি বিচার করা যায় 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'-র মতো গানকে, যে গান একটা গোটা জাতিকে উঠে দাঁড়াবার শক্তি জোগাতে পারে? অথবা, যদি একেবারে বিচ্ছিন্ন আর নির্জন এককের কথাই ধরেন, ' পুরনো সেই দিনের কথা'র মতো চমৎকার একটি গান আত্মগত হয়ে গাইতে গেলে কারোর কি মনে আসে কোনো স্কটিশসুরের ছায়ায় এ গানের গড়ে ওঠা? খুব কি দরকারও হয় এই গানকে বা অন্য গানগুলোকে কথার মূল্যে অনুভব করতেগেলে তথাকথিত উৎস-গান (নাকি মূল-গানকে) জেনে নেবার? মনে হয় কি ওইটি মূল আর এইটি তার শাখা-উপশাখা?

বরং যখন কোনো পরিচিত শিল্পী উল্টে াটাই করে বসেন, মূল-গান আর ভাঙা-গানের একরকম ধারণা সঞ্চার করে দেন রবীন্দ্রগানের শ্রোতার সামনে, তখন সহজ সুত্রায়ণে অনেকের কাছেই এক সহজ সমীকরণ হয়ে ওঠে - এই গান মানে তাহলে ওই গানের সুর! আমাদের স্বাভাবিক মনন সূক্ষ্ম বিচারের পথে পারতপক্ষে চলতে চায় না, স্থুল সিদ্ধান্তের দিকেই তার সহজাত আনতি। আর এই ঘুলিয়ে দেওয়ার কাজটা গানের শিল্পীরা ত্রমাগত এ ক্যাসেটে, ও ক্যাসেটে, এই মঞ্চে, ওই মঞ্চে যখন দায়হীন ভাবে করে বেড়ান তখন আমাদের প্রাপ্তির ভাঁড়ার তলানিতে ঠেকে, আর, রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের ভাবনা, সৃজন বৈচিত্র কোন্ অধঃপাতে তলিয়ে যায় কে জানে।

অথচ, বিশ্বভারতী কোনো দায় পালনের কথা ভাবেন নি এতকাল ধরে, মুষ্টিমেয় শিল্পী লাগামছাড়া ভাবে নৈরাজ্যের পরিবেশ তৈরি করেছেন এতদিন ধরে। এখন স্বত্বমুক্ত রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে তাঁদের পোয়া বারো - রবীন্দ্রনাথের গানকে ব্যক্তিগত কেরামতির উপজীব্য করে এক অশ্লীল মহোৎসবে আপাতত তাঁরা মগ্ন। ঠুঁটো জগন্নাথ বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির এখন রা কাড়ার উপায় নেই। গ্রামোফোন কোম্পানির একটা পর্যায় পর্যন্ত গুণগত মান বিচারের একরকম জায়গা ছিল, হাত-বদলে-যাওয়া নতুন কোম্পানী ক্যাসেট-যুগে সে সবের তোয়াক্কা করেন বলে মনে হয় না। পাশাপাশি, অন্য অনেক

ক্যাসেট-কোম্পানি রে রে করে বাজারে নেমেছেন লাভের কড়ির মুখ দেখার আশায়, গানের ভাঙাভাঙির এই দায়িত্বজ্ঞানহীন খেলায় এঁদের কিছু যায় আসে না। আর এই ভাঙাভাঙির কারিগররা মনে করতে আরম্ভ করেন, রবীন্দ্রনাথের গানের একঘেয়েমি কাটাতে এই ভাঙা-গানের কাহিনী এক অব্যর্থ মহৌষধ (সম্প্রতি আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে এক প্রথিতযশা শিল্পী এ কথা কবুল করেছেন।)

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গান ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই যে অশিক্ষিত পটুত্বের উপদ্রব, এবার তার ষোলোকলা পূর্ণ হওয়ার পথে। অথচ কেউ ভেবে দেখেন নি, রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার ক্ষেত্রে শিল্পীর যদি কিছুমাত্র পরীক্ষার জায়গা থেকে থাকে, তা হলো, সুরের তরী বেয়ে গানের কথার যে অপার ব্যঞ্জনা, তাকে শ্রোতার কাছে সত্য মূল্যে পৌঁছে দেওয়া। তান বিস্তারের কণ্ঠসামর্থ বা ভাঙা-গানের বিভ্রান্তির কোনো জায়গা সেখানে নেই। কারণ, গান আর তার শ্রোতার মাঝখানে বসে থাকা, শিল্পীর কাছে একমাত্র এই-ই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা। মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস আগে 'গীতালি' সংগীতসংস্থায় একটি অভিভাষণে তিনি মিনতি করে বলেছেন ঃ ... তোমাদের কাছে আমার মিনতি -- তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনতে পারি। ... নিজে রচনা করলুম, পরের মুখে নষ্ট হচ্ছে, এ যেন অসহ্য।

হয়তো, বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো, তবু চারদিক দেখে শুনে, বিবেকের তাড়ানায় এসব কথা ফিরে ফিরে বলতে হবে আমাকে-আপনাকে। রবীন্দ্রনাথ ইহজীবন থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন, আমরা তো এখনো বেঁচে-বর্তে আছি! হাজার ব্যস্ততায় মজে আছি আমরা, তবু রবীন্দ্রনাথের গানের এই ভেজাল কারবারিদের জন্য সুতীব্র ঘৃণা আর ধিক্কার জানাতে যেন আমরা ভুলে না যাই!

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com